রবীন্দ্রনাথের বিজয়া ও
পিকাসোর নারীরা

[নন ফিকশন]

রবীন্দ্রনাথের বিজয়া ও পিকাসোর নারীরা

আনোয়ারা সৈয়দ হক

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99293-5-2

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

র বী ন্দ্র না থে র বি জ য়া ও পি কা সো র না রী রা
আনোয়ারা সৈয়দ হক

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
কপিরাইট © লেখক
ছবি © Getty Images
প্রচ্ছদ ও বইনকশা : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৩৫০ টাকা

Rabindranather Bijaya O Piccasor Narira
by Anwara Syed Haq

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer

Printed and bound in Bangladesh

উৎসর্গ

কবি অসীম সাহা ও
চিত্রশিল্পী আমিনুল ইসলাম

সূ চি

রবীন্দ্রনাথের বিজয়া ৯
পিকাসোর নারীরা ৭৭

রবীন্দ্রনাথের বিজয়া

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিজয়াকে নিয়ে আমাদের মনে কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা অনেক। বিশেষ করে আমরা যারা সেই গল্পটা জানি যে, একবার আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেস থেকে কবিগুরু যখন জাহাজে করে ফ্রান্সে যাচ্ছিলেন, তখন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামের এক আর্জেন্টাইন মহিলা একরকম জোর করে একটি বসার চেয়ার জাহাজের কেবিনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যে কেবিনটি ছিল কবিগুরুর বসার ঘর। এই চেয়ারটি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো কবিকে উপহার দিয়েছিলেন জাহাজে বসে চিন্তাভাবনা করার জন্য। কিন্তু চেয়ারটা এত বড় ছিল যে, জাহাজের কেবিন দিয়ে ঢুকছিল না। জাহাজের ক্যাপ্টেন চেয়ারটা নিতে আপত্তি করেছিলেন। এই নিয়ে কিছু খটাখটি হয়েছিল। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার জেদের কাছে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে হার মানতে হয়েছিল। শেষে মিস্ত্রি ডেকে জাহাজের কেবিনের দরজার কব্জা খুলে দরজা বড় করে সেই চেয়ারটি ঢোকানো হয়েছিল কেবিনে।

কবিগুরু আদর করে মহিলাটির নাম দিয়েছিলেন বিজয়া এবং দেশে ফিরে তার রচিত *পূরবী* কাব্যগ্রন্থটি এই মহিলার নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। পেরু সরকারের আমন্ত্রণে পেরু যাবার পথে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে গিয়ে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাধ্য হয়ে সেখানে যাত্রাবিরতি ঘটাতে হয় এবং ডাক্তারদের পরামর্শে বিশ্রাম নিতে হয়। তখন এই বিজয়ার সাথে কবিগুরুর সাক্ষাৎ এবং গভীর হৃদ্যতা হয়েছিল। যে হৃদ্যতাকে প্রেম বলে বাঙালি পাঠকেরা অনেকেই মনে করে থাকেন।

- *মিরালিওর বাগানে কবি ও তাঁর বিজয়া*

অনেকেই মনে করেন প্রথমদর্শনেই কবি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। জন্মরোমান্টিক কবিদের জন্য প্রথমদর্শনেই রমণীদের প্রেমে পড়া আশ্চর্যের কথা নয়, কিন্তু সে সময় কবি নিজের অসুখ, অনিচ্ছাকৃত যাত্রাবিরতি, পেরু যাবার অনিশ্চয়তা নিয়ে নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। তার ওপর টাকাপয়সার প্রচণ্ড অভাব। সুতরাং প্রথমদর্শনে প্রেম হয়ে যাবার সম্ভাবনা তার তখন কম ছিল। তিনি প্রেমে পড়েছিলেন পরে। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ির জন্য, তার সুখসুবিধার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে দেখে। তবে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ভিক্টোরিয়া কবিকে দেখামাত্র প্রেমে পড়েছিলেন এবং এই প্রেমে পড়ার জন্য যেন বহু আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন তিনি।

তবে ভিক্টোরিয়াকে দেখে প্রথমদর্শনে প্রেম যদি কারও হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হয়েছিল কবির সেক্রেটারি লিওনার্দ এলমহার্স্টের! এই মানুষটি সারা জীবন নেপথ্যেই থেকে গেলেন। ভিক্টোরিয়ার প্রতি তার প্রেম ভিক্টোরিয়াকে লেখা বিভিন্ন চিঠি এবং নথিপত্র থেকে বোঝা যাবে। প্রথমদর্শনে প্রেম না হলে কবির সেক্রেটারি অচেনা এক মহিলার সাথে প্রথমদর্শনেই নিজের সমস্যার কথা কেন বলবেন? জাতে তিনি ইংরেজ। তার ওপর পৃথিবীর অর্ধেক দেশ তখন ইংরেজ-সাম্রাজ্যের আওতায়। নিজের সমস্যার কথা তিনি তো বলবেন একজন ইংরেজ পুরুষের কাছে বা সেই ধরনের কোনো ব্যক্তিত্বের কাছে। একজন তরুণী নারীর কাছে কেন? কথাটা ভাবতে হবে।

পূরবী কাব্যগ্রন্থের বেশ ক'টি কবিতা ভিক্টোরিয়াকে সামনে রেখে লেখা—এ রকম মনে হবার কারণ আছে, কারণ কবি নিজেই ভিক্টোরিয়াকে কাব্যগ্রন্থটি পাঠাবার সময় লিখেছিলেন যে, তার কবিতার পাঠকেরা *পূরবী* কবিতাগ্রন্থটি পাঠ করার সময় বুঝতেও পারবে না যে, তার সম্বোধিত বিজয়া মেয়েটি কে এবং কার প্রকৃত নামের সাথে কবিতাগুলি উৎসর্গিত। তবে এই উৎসর্গের ভেতরে কবির দায়মোচনও কিছুটা আছে। কারণ, ভিক্টোরিয়ার আন্তরিক আতিথ্য কবিতা ছাড়া কীভাবে তিনি পরিশোধ করতেন। তবে *পূরবী* কবিতার বইয়ের সব

কবিতাই ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে লেখা নয়। মাত্র ক'টি কবিতার ভেতরে ভিক্টোরিয়ার অস্তিত্ব গভীরভাবে টের পাওয়া যায়।

অবশ্য একজন কবির প্রেম তো জীবনের ঘাটে ঘাটে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন কবির জীবনে। এই বইটিতে আমি তাদের দুজনের প্রেমকে একটি ভিন্নদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি এ কথা বলতে যে, শুধু কবিগুরু এবং ভিক্টোরিয়া নয়, কবির সেক্রেটারি লিওনার্দ এলমহার্স্টও এই প্রেমের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বুয়েনস আইরেসে মাত্র দুমাসের অবস্থানে দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একটি প্রেমমঞ্চে যেন অভিনয় করেছিলেন বড় সততা এবং অধ্যবসায়ের সাথে! দুটি মাসের প্রতিটি দিন ছিল তাদের জীবনে বিশেষ এক ধরনের সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, যার রেশ সারা জীবনের জন্য তাদের চলার পথে স্থায়ী হয়েছিল।

বিজয়ার পিতৃদত্ত নাম ছিল রুমোনা ভিকতোরিয়া এপিফানিয়া রুফিনা ওকাম্পো। ভিকতোরিয়া বা ভিক্টোরিয়া নামটির ভেতরেই আছে বিজয়া। জন্ম হয়েছিল সাতই এপ্রিল আঠারোশো নব্বই সালে, আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসের ভিয়ামন্তে নামের একটি জায়গায়। তিনি ছিলেন বড়লোকের দুহিতা। পাঁচ বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন তিনি। ছেলেবেলায় ইংরেজ এবং ফ্রেঞ্চ গভর্নেসের কাছে ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চ শিখেছিলেন।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতটা বড় চমকপ্রদ। উনিশশো চব্বিশ সালে কবি যখন পেরু সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশে যাচ্ছিলেন, আন্দেস জাহাজে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেস পর্যন্ত গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখটা ছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা, অর্থাৎ সর্দি, কাশি, জ্বর। আর্জেন্টিনার ডাক্তাররা কবিকে পরীক্ষা করে তাকে স্থলপথে পেরু যেতে নিষেধ করলেন। ট্রেনে ভ্রমণ করলেও পর্বতের গুহা অতিক্রম করার সময় অক্সিজেনের দারুণ অভাব হয়ে যেত আর তখন আরও অসুস্থ হয়ে পড়তেন তিনি। বাধ্য হয়ে কবিকে তখন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুয়েনস আইরেসে যাত্রাবিরতি করতে হলো। কবির বয়স ছিল তখন তেষট্টি বছর। এ সময় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাথে তার পরিচয়।

দুই

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মাতৃভাষা স্প্যানিশ। তার বয়স তখন ছিল চৌত্রিশ। ধর্মে রোমান ক্যাথলিক। ছিলেন বিবাহিতা। কিন্তু স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়াতে বিয়ের কয়েক মাসের ভেতরেই আলাদা থাকতে শুরু করেছিলেন। তার ধর্মে বিবাহবিচ্ছেদ তখন করা যেত না। কিন্তু বিবাহপূর্ব এত জানাশোনার পরেও বিবাহপরবর্তী মাত্র কয়েক মাসের ভেতরে এ রকম আজীবন বিচ্ছেদ, তার পেছনে কারণ ছিল।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো দেখতে ছিলেন আকর্ষণীয়া, চালচলনে অভিজাত কিন্তু খুব মেজাজি এবং কিছুটা বা খেয়ালি। ছিলেন আবেগপ্রবণ। এমনও শোনা যায়, তার মেজাজ সকাল-বিকাল পালটাত। ফলে তার পরিবারের লোকজন, বিশেষ করে বাড়ির কর্মচারীরা, তাকে খুব ভয় পেতেন। গোপনে তাকে বাঘিনী বলে সম্বোধন করতেন। জাগতিক বিষয়-আশয়ের দিকে তিনি ছিলেন উদাসীন। কিন্তু আবার মানুষের সাথে, বিশেষ করে পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষদের সাথে, বন্ধুত্ব পাতানোতে তার ছিল অপরিসীম মুনশিয়ানা এবং আবেগ। সেই বয়সে, অর্থাৎ সেই চৌত্রিশ বছর বয়সেই তিনি পরিচিত একজন লেখক হয়ে উঠেছিলেন আর্জেন্টিনায়। তখনকার দিনে কোনো মহিলাকে লেখক হয়ে উঠতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত, বিশেষ করে আর্জেন্টিনার মতো দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশে। আর্জেন্টিনার *লা ন্যাসিয়ন*-এর মতো পত্রিকায় উনিশশো বিশ সালে তার লেখা ছাপা হয়েছে এবং সেখান থেকেই শুরু। ইতোমধ্যে তিনি গান্ধী, দান্তে ও রাস্কিন সম্বন্ধে লিখেছেন; বন্ধুত্ব করেছেন ভার্জিনিয়া উলফের মতো সাহিত্যিকের সঙ্গে; গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল এবং কাইজার লিং-এর মতো ভাবুকদের সাথেও তার সখ্য; লরেন্স অব এরাবিয়ার সাথেও তার গড়ে উঠেছিল গভীর এক বন্ধুত্ব। আবার তার নিজের দেশের এক পুরুষের সাথেও ছিল তার বোঝাপড়ার সম্পর্ক, যে সম্পর্ক দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। এদিকে বিশ্বের নামকরা সব

লেখকদের লেখা তিনি অনুবাদ করে চলেছিলেন এককভাবে। আবার কিছু বছর পরে বের করেন একটি পত্রিকা, যার সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজেই। এটি ছিল বুয়েনস আইরেসের প্রসিদ্ধ একটি সাহিত্যপত্র, নাম ছিল *সুর*। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সেটি তিনি সম্পাদনা করেন। এসব অবশ্য ঘটে কবিগুরুর সাথে পরিচয় হবার পরে।

তরুণী বয়স থেকেই ভিক্টোরিয়া ছিলেন আর্ন্তজাতিক সেতুবন্ধনে বিশেষ উদ্যোগী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে এবং সেসব দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে তার গভীর আগ্রহ ছিল জীবনের শুরু থেকেই। তিনি ছিলেন নারীবাদের একজন শক্তিশালি সমর্থক। আর্জেন্টিনায় পেরনের রাজত্বকালে বাকস্বাধীনতার দাবিতে তিনি কারারুদ্ধ হন কিছুদিনের জন্য এবং সে সময় তিনি সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন, যা তাকে পরবর্তীকালে সমাজকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। তিনি ছিলেন নারী আন্দোলনেরও একজন মুখপাত্র। কারণ, তার পরিবার ছিল গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের ধর্মে তালাক প্রচলিত ছিল না। সে জন্য জীবনের শুরুতে একটি ভুল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এবং স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে তাকে প্রতিনিয়ত স্বাধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার জীবনের অর্জিত কর্মকাণ্ড একসময় তাকে বিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট নারীব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত করে।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের সাথে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর দেখা হবার আগেই ভিক্টোরিয়া পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*। আর তা পড়ে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, *গীতাঞ্জলি* নিয়ে *লা ন্যাসিয়ন* পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। সেটা উনিশশো চব্বিশ সালেই। আবার এর ভেতরেই তিনি ক্রমাগত রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লিখে চলেছিলেন একের পর এক চিঠি, যে চিঠি কোনোদিনই তিনি ডাকে ফেলেননি। এইসবের ভেতরেই রবীন্দ্রনাথ গিয়ে হাজির হলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর দেশে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসীম প্রাণশক্তিতে ভরপুর একজন মানুষ। কিন্তু তারপরও ছেলেবেলা থেকেই তার জীবন খুব সুখের ছিল না। তিনি ছিলেন

সংসারের সবচেয়ে ছোট ছেলে এবং বাড়িভরতি মানুষজনের ভেতরে একাকী একটি শিশু। তার বাবা ছিলেন জমিদার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার দাদা ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথের চরিত্র ছিল বহুমুখী প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। মৃত্যুকালে প্রচুর দেনা রেখে গিয়েছিলেন, যে দেনার বোঝা এসে চেপেছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘাড়ে, কিন্তু তিনি বুদ্ধি এবং ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলো পরিশোধ করে জমিদারি রক্ষা করেছিলেন।

ভবিষ্যতের কবি রবীন্দ্রনাথের ভেতরে ছেলেবেলা থেকে আচরণগত কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল। যেমন—তিনি খুব ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন, আপন মনে একা একা খেলা করতেন, ঋতু পরিবর্তন খেয়াল করে দেখতেন; দুপুরের ঘন রোদ, সূর্যাস্তের গোধূলি, রাতের চন্দ্রালোকিত আকাশ তার শিশুমনে আনন্দের দোলা দিয়ে যেত। ঘন বর্ষায় যখন ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেত দুনিয়া, তখন রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হতেন। বর্ষার ওপর অনেক ভালো ভালো কবিতা ও স্মরণীয় গান লিখেছেন তিনি। 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা। কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা', এ তো তারই লেখা। শুধু প্রকৃতি নয়, তার পরিবেশের মানুষজনও তাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতেন। তার পরিবেশের চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো আত্মীয়স্বজন, কাজের মানুষজন, তার মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী যাকে তিনি ডাকতেন বৌঠান বলে—এরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে শিশু রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রভাবিত করতেন। বিশেষ করে কাদম্বরী দেবীর সাথে ছিল তার গভীর বন্ধুত্ব। বয়সে দু'বছরের বড় এই কাদম্বরী দেবী ছিলেন তার খেলার সঙ্গী। তার ছেলেবেলার লেখার অনুপ্রেরণা। ছেলেবেলায় মাকে তিনি কাছে পাননি। কাদম্বরী দেবীই রবিকে গভীর স্নেহে বেঁধে রেখেছিলেন। কাদম্বরী দেবীর নিজের জীবনটাও যেন ছিল মরুভূমির মতো শুকনো। তার স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বদাই নিজের কাজকর্ম এবং বন্ধুদের নিয়ে মেতে থাকতেন। বাড়িতে একাকী পড়ে থাকা বালিকা-বধূ কাদম্বরী দেবীর কথা তার বিশেষ মনে থাকত না। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের চার মাসের মাথায় সন্তানহীনা কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করে নিজের

অবহেলিত জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছিলেন।

স্কুলজীবন রবীন্দ্রনাথের একেবারে ভালো লাগত না। তিনি ছিলেন ছেলেবেলা থেকেই মুক্তমনের মানুষ। সে সময় জমিদার বংশের ছেলেরা অনেকেই স্কুল-কলেজে ফরমায়েশি লেখাপড়া করতেন না, শিক্ষক বাড়িতে এনে তাদের কাছে বিদ্যাপাঠ নিতেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারেও এর অন্যথা হয়নি। তিনি ছেলেবেলা থেকেই বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে পড়াশোনা করে অল্পবয়সেই এসব বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। তার পরিবারের ভেতরেই ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের চর্চা ছিল। আবার এটাও সত্য যে একদিকে তিনি যেমন বেদ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারতের সারসত্য নিজের হৃদয়ে ধারণ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে তার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাফিজ, ওমর খৈয়াম, প্রমুখ পারস্যের কবি এবং সাধকদের দ্বারাও নিজের হৃদয়কে করেছেন সুফি ধ্যানধারণায় প্লাবিত। তার জ্যোতিদাদা বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এসব ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহী ছিলেন। ছোট্ট রবির যেকোনো রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহ রবীন্দ্রনাথকে আরও ভালো, আরও বড় কিছু করার প্রেরণা যোগাতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের এই সৃজনীপ্রতিভাকে স্বাগত জানালেন খুশিমনে।

রবীন্দ্রনাথের ষোলো বছর বয়সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাকে ব্যারিস্টারি পড়াবার জন্য বিলেত পাঠালেন। বিলেতে যাওয়ার পথে বোম্বেতে ছিলেন কিছুদিন তার দাদা সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু আত্মারাম পান্ডুরঙ্গের পরিবারে। পান্ডুরঙ্গের তিনটি মেয়ের ভেতরে সবচেয়ে ছোটটির সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রেমসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। মেয়েটির নাম ছিল আনা তড়খড়। রবীন্দ্রনাথ তার কবিতা এবং গানে আনা তড়খড়কে 'নলিনী' নামে সম্বোধন করলেন। বিলেতে এক ইংরেজ পরিবারের সাথে রবীন্দ্রনাথ থাকতে শুরু করলেন এবং ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কিন্তু তার মন এইসব গতানুগতিক লেখাপড়ার দিকে কোনোদিন ছিল না। তিনি

ব্যারিস্টারি পড়া অসমাপ্ত রেখে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে; অর্থাৎ নিজের দেশে। এখানে ফিরে এসে আবার তিনি সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করলেন। এবং তার লেখার জন্য ব্যাপক সাড়া পেলেন বাঙালি সমাজে। তিনি যে তার মনপ্রাণ নিবেদন করেছেন সাহিত্যের বেদিতে, ততদিনে মানুষ সেটা বুঝতে শুরু করেছে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন উনিশ, তখন পরিবারের ইচ্ছায় তখনকার যশোর জেলার একটি পরিবারে তাকে বিবাহ দেয়া হয়। বিয়ের সময় তার স্ত্রী ভবতারিণীর বয়স ছিল মাত্র নয়। বিয়ের পরপরই ভবতারিণীর নাম পালটে রাখা হয় মৃণালিনী।

কালে কালে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন একজন কবি। বিরাট মাপের কবি। তার কবিত্ব প্রতিভায় সারা দেশ যেন প্লাবিত হতে লাগল। আর শুধু তো কবিতায় নয়, কবিতা ছাড়াও তিনি রচনা করতে লাগলেন উপন্যাস এবং গল্প, হয়ে উঠলেন একজন নাট্যকার এবং প্রবন্ধ রচয়িতা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার লেখা বেরোতে থাকে। প্রতিবছর বেরোতে লাগল তার লেখা বই। ইতোমধ্যে কবি নিজের হাতে ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন তার কবিতার বই, যে বইয়ের নাম ছিল *গীতাঞ্জলি*। এই বই প্রকাশ করতে সাহায্য করলেন তার কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু। তার ভেতরে ডব্লিউ বি ইয়েটস এবং রোদেনস্টাইনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গীতাঞ্জলি ইংরেজিতে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে যেন হইচই পড়ে গেল। এত ভাবগম্ভীর কবিতার বই, এত দার্শনিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট বই যেন এর আগে ভারতবর্ষের কেউ প্রকাশ করেননি। এই বই প্রকাশের কিছুদিনের ভেতরেই তিনি সুইডিস অ্যাকাডেমি পরিচালিত নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেলেন। পাওয়া না বলে এটাকে তার অর্জন বলা ভালো। সেটা ছিল উনিশশো তেরো সাল। ছিল নভেম্বর মাসের তেরো তারিখ। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস—যিনি কবিকে *গীতাঞ্জলি* বের করতে সাহায্য করেছিলেন, তিনি কবিকে অভিনন্দিত করে বললেন, 'গ্রেটার দ্যান এনি অব আস'। ইংল্যান্ডের একটি ইংরেজি সাহিত্য পত্রিকায় লেখা হলো, 'দি সংগস্ অব গীতাঞ্জলি ইভেন ইন দি ইংলিশ প্রোজ রিদম্স

আর ইরেজিসটিব্লি ইমপ্রেসিভ।' এই পুরস্কার পাওয়ার পর দেশের মানুষ যারা তার কবিতা পড়ে কট্টর সমালোচনা করত, তাদের মুখ বন্ধ হলো। তাদের সে সমালোচনা ছিল কবি রবীন্দ্রনাথকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট কবিপ্রতিভাকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে বাঙালি কবি ও সাহিত্যিক সমাজের এক ধরনের ক্ষোভ এবং প্রতিহিংসার মনোভাব গোড়া থেকেই সোচ্চার ছিল। এমনকি যে প্রতিভার বিকাশ চৌদ্দ বছর বয়স থেকে বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে, সেই মানুষটির পঞ্চাশতম জন্মদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পালন করতে গেলে বাধা দেয়া হয় এবং এ কথা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ সবিনয়ে পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত জন্মদিন পালন প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু এই ঘটনায় তার মনে বড় দুঃখ হয়। তার প্রতি বাঙালির মনোভাব দেখে দুঃখ।

রবীন্দ্রনাথ কবিতায় সবচেয়ে বেশি দীপ্যমান হলেও উপন্যাস, নাটক, গান, সংগীত, কাব্যনাট্য—সাহিত্যের সব শাখাতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি শিলাইদহ বা পতিসরে জমিদার থাকার সময় তার জমিদারির চাষিদের জন্য তিনি অনেক সংস্কারমূলক কাজ করেছিলেন।

শিক্ষাপ্রসারের দিকেও তার ছিল ঝোঁক। এই উদ্দেশ্যে উনিশশো এক সালে তিনি শান্তিনিকেতন স্থাপন করেন। এটি বিদ্যাচর্চার একটি আশ্রমের মতো। সেখানে খোলা আকাশের নিচে ছাত্রদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। প্রকৃতির সাথে মিশে ছাত্রদের বিদ্যার্জনই ছিল তার লক্ষ্য। তিনি নিজেও সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন।

কিন্তু কবির ব্যক্তিগত জীবনে ঝড়ঝাপটা লেগেই ছিল। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তার পত্নীবিয়োগ হয়। মৃণালিনী দেবী ছোট ছোট সন্তান রেখে ইহলোক ত্যাগ করলেন। লেখালেখির জগতে প্রচণ্ড সুনাম, সেইসাথে প্রচণ্ড কাজের চাপ, তার ওপর অকাল পত্নীবিয়োগে বাচ্চাদের দেখাশোনার ভারও তার হাতে এসে বর্তাল।

শান্তিনিকেতন পরবর্তীকালে একটি অভূতপূর্ব বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে ওঠে এবং পরে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, নাম হয় বিশ্বভারতী।

আর্জেন্টাইন প্রকাশক ও লেখক ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো —ছবি লুই লেমোস

তিন

এদিকে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের জীবন আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শুরু হলো সারা বিশ্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ। সকলেই যেন এই ঋষি এবং কবি মানুষটিকে একবার চোখে দেখতে চান। তার কাছ থেকে শুনতে চান ভারতের কথা। ততদিনে মহাত্মা গান্ধীও বিশ্বজুড়ে নাম করেছেন ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে। তার নামও সকলেই

জানেন, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোও জানেন এবং ইতোমধ্যেই গান্ধীকে নিয়ে লিখেছেন প্রবন্ধ। পরবর্তীকালে তার স্মৃতিচারণে বলেছেন,

> *আমাদের একদিকে গান্ধী অন্যদিকে গুরুদেব। আমরা অনেকেই ধরতে পারছিলাম না যে কাকে বেছে নেব। সুদূর রহস্যময় দেশের এ দুই পথিক প্রায় একই সঙ্গে আবির্ভূত হলেন আমার জীবনে। বপন করে দিলেন এই সমস্যা! শিল্পী না সন্ত?*

যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে তখন ছিল পানির জাহাজ। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে গেলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস লেগে যেত। তবু এর ভেতরেও কবি রবীন্দ্রনাথ বহুদেশ ভ্রমণ করে ফেললেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও চীন ভ্রমণ করলেন। সকলেই এ সময় যেন তাকে কবির চেয়ে বড় করে দেখতে লাগলেন ভারতের একজন ঋষি হিসেবে। তার ব্যক্তিগত পোশাক-পরিচ্ছদও হয়তো এ জন্য কিছুটা দায়ী ছিল; কারণ, তিনি ঋষিপ্রকৃতির মানুষের মতো ঝোলা জামাকাপড় বা জোব্বা পরতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, শুধুমাত্র কবি। আনুষঙ্গিক অন্য যা কিছু তার চরিত্রে এবং ব্যক্তিত্বে ছিল, সেটা ছিল তার সামগ্রিক একটি বাইরের রূপ বা চেহারা।

যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভেতরে সবসময় একটা সুদূরতা যেন খেলা করত। অচেনা এক মানসী কবির কবিতা জগৎকে যেন মাঝে মাঝে আলোড়িত করে তুলত। তাকে কবি চেনে না, তাকে কোনোদিন চোখে দেখেননি, আবার যেন চেনেনও এবং যেন চোখেও দেখেছেন, এ রকম মনে হত তার কিছু কিছু কবিতা পড়ে। কখনো তিনি গান রচনা করেছেন এই কথা বলে যে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী'। অথবা কখনো তিনি তার *জীবনস্মৃতি*তে লিখেছেন,

> *কোন রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার (বিদেশিনীর) বাড়ি, তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে*

পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো-বা শুনিয়াছি।

খুব নির্বিকারভাবে বিচার করলে এ সবই কবির অন্তর-রহস্যজগতের কল্পনার সৃষ্টি বলে মনে হয়, কারণ কবির মনোজগৎ আর সাধারণ মানুষের মনোজগতের ভেতরে অনেক পার্থক্য আছে।

কিন্তু তারপরেও থেকে যায় কিছু কথা। কখন কল্পনা মানুষের বেশে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়? বিশেষ করে একজন কবির চোখের সামনে? যে কবির কবিতার ভেতরে একজন বিদেশিনীর আনাগোনা সেই কতকাল ধরে। যে বিদেশিনী মানুষটি অচেনা দেশ আর্জেন্টিনার পটভূমিতে ঝড়ের বেগে এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন?

রবীন্দ্রনাথ এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ওরফে বিজয়ার গল্প তাহলে এখান থেকেই শুরু হোক।

পেরুর আমন্ত্রণে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসে এসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি তার সেক্রেটারিকে নিয়ে প্লাসা হোটেলে উঠেছিলেন। সেক্রেটারির নাম ছিল লিওনার্দ এলমহার্স্ট। লিওনার্দ এলমহার্স্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অবৈতনিক সেক্রেটারি। তিনি ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত একজন যুবক ও কৃষিবিদ। তিনি সর্বক্ষণ ছায়ার মতো কবিকে অনুসরণ করতেন।

কবির যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল পেরু যাওয়া, সে দেশের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে। কিন্তু আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখটা মূলত ছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা। কিন্তু অসুস্থতা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, ডাক্তাররা তাকে সে মুহূর্তে রাজধানী ছাড়তে মানা করলেন। তারা তাকে পরীক্ষা করে বললেন যে, রোগীর হৃদযন্ত্রের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। এই অবস্থায় কোনোমতেই তাকে পেরু যেতে দেয়া যায় না। কিন্তু সত্যিই কি তার হৃদযন্ত্র ততখানি খারাপ ছিল? আমরা সেটা জানি না, কারণ কবি যাতে পেরু না যেতে পারেন

তার জন্য ইতোমধ্যে কবির সেক্রেটারি লিওনার্দ এলমহার্স্টের সাথে ভিক্টোরিয়ার গোপন কথা হয়েছিল। ডাক্তাররা তাদের সহযোগিতা করেছিলেন। তারা সার্টিফিকেট দিলেন এই বলে যে তিনি অর্থাৎ কবি কিছুতেই লিমাতে (পেরুর রাজধানী) পৌঁছতে পারবেন না। পাহাড়ি পথে তার অক্সিজেনের অভাব হবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল, এটা অবশ্য সত্যি কথা। বরং পেরুর প্রেসিডেন্টকে তার করে দেয়া ভালো যে, তার অতিথি (কবি) এই শরীর নিয়ে পেরু পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। আবার নতুন করে জাহাজে যাত্রা শুরু করার আগেও তাকে সতর্ক হতে হবে। তাকে বুয়েনস আইরেসের কোনো গ্রামে গিয়ে বিশ্রাম নিতে ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন।

ডাক্তারদের কথায় কবির সেক্রেটারি লিওনার্দ এলমহার্স্ট পড়লেন যেন মহাবিপদে। এই অবস্থায় তিনি কী করবেন। প্রথম কথা, কবি বুয়েনস আইরেসে দীর্ঘদিন যাত্রাবিরতি করতে চাননি। দ্বিতীয় কথা, জায়গাটা তার একেবারে ভালো লাগছিল না। বিশেষ করে যে হোটেলটিতে উঠেছিলেন, সে হোটেলটি তার পছন্দ হচ্ছিল না। কারণ, সেখানে নির্জনতা ছিল না। তৃতীয় কথা, ডাক্তাররা তাকে যে সতর্কবাণী দিয়েছিলেন, তা মানতে তিনি মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাকে দেখতে আসছিলেন, তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হচ্ছিলেন, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না-করাটাকে তিনি অশোভন মনে করছিলেন। এত দূর দূর থেকে মানুষ তাকে দেখতে আসছিলেন যে তাদের সাথে দেখা না করাটাকে তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। বরং তাদের সকলের সঙ্গেই তার দেখা করাটাকে তিনি বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করছিলেন। শারীরিক অসুস্থতাকে কবি আমল দিতে চাইছিলেন না। এলমহার্স্টও যেন এ ব্যাপারে নিজেকে অসহায় মনে করছিলেন। কীভাবে তিনি কবিকে বোঝাবেন? বিদেশ বিভুঁইয়ে এমন কেউ ছিল না, যে তাদের কাছে নিজের দুর্ভাবনার কথাটা খুলে বলবেন।

ঠিক এইরকম এক সময়ে আর্জেন্টিনার লেখক ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এলেন কবিকে দেখতে তার এক বান্ধবীকে সাথে করে।

সত্যি কথা বলতে গেলে ভিক্টোরিয়া কবিকে দেখতেই এলেন, কথা বলতে নয়। কারণ, তার ভাষা ছিল স্প্যানিশ। ইংরেজি জানা থাকলেও ওরকম ইংরেজি জানা ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি কবির *গীতাঞ্জলি* নিয়ে আলোচনা করবেন। ভিক্টোরিয়ার বান্ধবীর নাম ছিল আদেলিয়া আসেভেদো। এলমহার্স্ট তাদের নিচের ঘরে বসিয়ে তার দুর্ভাবনার কথা তাদের জানালেন। বোঝা যায়, অচেনা দুজন তরুণীর কাছে সব খুলে বলে নিজের মনের দুশ্চিন্তা হয়তো কিছুটা লাঘব করতে চেয়েছিলেন।

লিওনার্দ এলমহার্স্টের কথা শুনে আবেগপ্রবণ ভিক্টোরিয়া হঠাৎ প্রস্তাব করে বসলেন যে, যদি এলমহার্স্ট ইচ্ছে করেন, তবে ভিক্টোরিয়া কবির বিশ্রামের জন্য একটা বাগানবাড়ির ব্যবস্থা করবেন, যেখানে কবি প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন এবং লিখতে পারবেন কবিতা। তাছাড়া বেশি ভিড়ও সেখানে হতে পারবে না।

অথচ তখন পর্যন্ত বাগানবাড়িটা যে কোথায় হবে, কীভাবে তা পাওয়া যাবে ভিক্টোরিয়া জানতেন না। তাছাড়া কবির সাথে তার তখন সাক্ষাতও হয়নি। কিন্তু সে মুহূর্তে এতসব বৈষয়িক কথা ভাবতে তিনি রাজি ছিলেন না। তিনি মনেপ্রাণে চাইছিলেন কবি যেন তার আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহলে তার নৈকট্য তিনি লাভ করতে পারবেন, তার কাছে কাছে থাকতে পারবেন। তার কথা প্রাণভরে শুনতে পারবেন। বিশ্বখ্যাত এই কবি তারই প্রিয় শহরে এসে হাজির হয়েছেন, হয়তো তার মনের প্রচণ্ড টানেই এসেছেন। তাকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ ছাড়তে তার মন রাজি ছিল না।

সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ নামে যে বইটি পরবর্তীকালে ভিক্টোরিয়া লিখেছিলেন, সেখান থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেয়া যাক :

> *আমি হঠাৎই এলমহার্স্টের কাছে প্রস্তাব করে বসলাম যে ওরা দুজন (রবীন্দ্রনাথ এবং এলমহার্স্ট) সান ইসিদ্রোতে এসে থাকুন না কেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারের জন্য পুরো একটি বাড়ি ছেড়ে*